দ্বীপান্তরী অভিরাম

অরুণ নাগ

ঘটনাটি সকলের জানা, স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য সংক্ষেপে বলা যাক।

১৯০৪ সালে কলকাতার চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন কিংসফোর্ড। উগ্র সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ও ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের কঠোর শাস্তিদানের কারণে তিনি বিপ্লবীদের লক্ষ্য হয়ে ওঠেন। খবর পেয়ে গোয়েন্দা বিভাগ সরকারকে সতর্ক করে দেয়। ইতিমধ্যে বইয়ের ভিতর বোমা পাঠিয়ে কিংসফোর্ডকে হত্যার একটি চেষ্টা নিষ্ফল হয়। নিরাপত্তার কারণে সরকার তাঁকে বদলি করে ও ১৯০৮ সালের ২৮শে মার্চ কিংসফোর্ড মজঃফরপুরের জেলা ও সেসন জজের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বিপ্লবীরা হাল ছাড়েননি, কিংসফোর্ডকে হত্যার উদ্দেশে সংগঠনের নির্দেশে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী মজঃফরপুরে যান। ১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল রাত্রে যে ঘোড়ার গাড়ির ওপর তাঁরা বোমা ছোঁড়েন, তাতে কিংসফোর্ড ছিলেন না, ছিলেন মিস ও মিসেস কেনেডি। একজনের তখনি মৃত্যু ঘটে, অপরজন মারা যান হাসপাতালে। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল দুজনে দুদিকে পালান। পথশ্রান্ত অবস্থায়, পরদিন,

১লা মে সকালে রিভলবার সমেত ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন ওয়াইনি স্টেশনের কাছে, অপরদিকে গ্রেপ্তার অনিবার্য দেখে সেইদিন মোকামাঘাটে প্রফুল্ল রিভলবারের গুলিতে আত্মহত্যা করেন। ক্ষুদিরামের মামলা শুরু হয় ২১শে মে, তিনি অভিযোগ স্বীকার করেন। মামলা দায়রায় সোপর্দ হয় ২৫শে মে, ১৩ই জুন রায় বার হয়, প্রাণদণ্ড। হাইকোর্টে আপিলের তারিখ ৬ই জুলাই, দণ্ডাদেশ বহালের রায় বার হয় ১৩ই জুলাই। ১১ই আগস্ট, ভোর ছ'টায় মজঃফরপুর জেলে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়।

ক্ষুদিরামের ফাঁসির অব্যবহিত পরে একাধিক গান রচিত হয়, তার একটি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে, 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি'। ব্রিটিশ সরকার গানটি হুকুম জারি করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল কিনা জানা নেই, তবে ১৯৪৭ সালের আগে প্রকাশ্য মুদ্রণেরও কোনো উদাহরণ নেই। গানটির নিষিদ্ধকরণ, রচনার কাল ও জনপ্রিয়তার পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় অন্য একটি খবর থেকে। ক্ষুদিরামের ফাঁসির পর এক রকম স্বদেশী ধুতি বাজারে বেরোয় যার পাড়ে বুনে লেখা থাকত 'বিদায় দে মা ঘুরে আসি'। ১৯১০ সালের ১২ই মার্চ সরকারি আদেশে এই ধুতির পাড় নিষিদ্ধ করা হয়।[১]

বাংলা ভাষাভাষী সমস্ত অঞ্চলে গানটি জনপ্রিয় হয় মূলত শহীদ-গীতি (martyrs' song) রূপে, যা আজও অব্যাহত, এবং যে রূপে অবাঙালি সংগ্রামীরাও একে গ্রহণ করেছেন।[২] পরবর্তীকালে বাঙালি ঐতিহাসিক, যাঁরা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করেছেন, গানটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য ও স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি ভারতীয় মানসিকতার রূপ বোঝাতে এর উল্লেখ করেছেন।[৩]

গানটির আদি পাঠ কী ছিল, তা আজ নিশ্চিতভাবে জানার কোনো উপায় নেই। মুদ্রিত পাঠের অনুপস্থিতি, অপরদিকে লোকমুখে বিস্তার— ফলে প্রচুর সংযোজন ও বিয়োজন ঘটেছে, এবং সে জন্য যতগুলি মুদ্রিত পাঠ আজ লভ্য, তার একটির সঙ্গে অপরটি হুবহু মেলে না। গানটির উপজীব্য একটি বাস্তব ঘটনা। গানের প্রথমাংশে সেই ঘটনার বর্ণনায় কোনো পাঠে 'ভুল' তথ্য বেশি, কোনো পাঠে তার বিপরীত। কেন এমন ঘটেছে তার কারণ অনুমানের চেষ্টা করা হয়েছে। গানের দ্বিতীয়াংশে পুনর্জন্মের প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি, তার যুক্তি ভিন্নতর হলেও অঙ্গাঙ্গী হওয়ার কারণে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। সকল পাঠের উল্লেখ স্থানাভাবে অসম্ভব, তাছাড়া প্রয়োজনও নেই। প্রতিপাদ্য প্রমাণের জন্য আমরা চারটি পাঠ ব্যবহার করব, প্রথমটি গ্রামোফোন রেকর্ডের, প্রকাশকাল নভেম্বর, ১৯৪৭,[৪] দ্বিতীয়টি ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত একটি গ্রন্থের।[৫] ১৯৪৭ সালে, ভারতের স্বাধীনতালাভের বছর, রাজদ্রোহে অভিযুক্ত হওয়ার আশঙ্কা দূর হওয়াতে প্রথম সুযোগেই বহু পুস্তক-পত্রিকায় বিভিন্ন পাঠে গানটি প্রকাশিত হয়।

(প্রথম)

এবার বিদায় দে মা ঘুরে' আসি ॥
হাসি' হাসি' পরবো ফাঁসি
দেখবে জগৎবাসী ॥

ওমা কলের বোমা তৈরী করে'
বসেছিলাম লাইনের ধারে
লাট ম'লোনা বিফল হোলো
ম'লো ভারতবাসী ॥

হাতে যদি থাকতো ছোরা
তোর ক্ষুদি কি পড়তো ধরা (মা গো)
আমি রক্তমাংস এক করিতাম
দেখতো ইংলন্ডবাসী ॥

ওমা শনিবার দিন বেলা দুটোতে
লোক ধরে না হাইকোর্টেতে
অভিরামের দ্বীপ দ্বীপান্তর মা
ক্ষুদিরামের ফাঁসি ॥

ওমা, দশমাস দশদিন পরে
জন্ম নেব মাসির ঘরে
চিন্‌তে যদি না পারিস্‌ মা
দেখবি গলার ফাঁসি ॥

(দ্বিতীয়)

একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।
শনিবার দিন ১০টা বেলা
হাইকোর্টেতে গেল জানা
(ওমা) অভিরামের দ্বীপ চালনা
ক্ষুদিরামের ফাঁসি।

(ওমা) কলের বোমা তৈরী করে
দাঁড়িয়েছিলাম লাইনের ধারে
(ওমা) বড়লাটকে মারতে গিয়ে
মারলাম ভারতবাসী।

হাতে যদি থাকতো ছোরা
তোর ক্ষুদি কি পড়ত ধরা
(ওমা) রক্তমাংসে এক করিতাম
দেখতো ইংলন্ডবাসী ॥

থাকতো যদি মা টাট্টু ঘোড়া
ক্ষুদিরাম কি পড়তো ধরা
(ওমা) এক চাবুকে চলে যেতাম
গয়া গঙ্গা কাশী।

বেলা ১০টা বেজে গেল
ফাঁসির হুকুম জারি হোল
(ওমা) হাসি হাসি পরব ফাঁসি
দেখুক ভারতবাসী।

১০ মাস ১০ দিন পরে
জন্ম নিব খুড়ির ঘরে
চিনতে যদি না পারিস্‌ মা
গলায় দেখিস ফাঁসি।

(ওমা) মনের দুঃখ মনে রইল
আমার হোল না স্বদেশী।
কাচের বাসন কাচের চুড়ি
প'রনা মা বিলাতি শাড়ী
এ মিনতি করি মাগো
ভুলো না স্বদেশী।

বিবৃত ঘটনাগুলিকে যে ক্রমে সাজানো যায়, ক) বোমা তৈরি, হত্যার চেষ্টা ও বিফল হওয়া, খ) অস্ত্রের অভাবে গ্রেপ্তার হওয়া, গ) দণ্ডাদেশ ও ঘ) পুনর্জন্মের প্রতিশ্রুতি। দ্বিতীয় পাঠের ঘটনাপরম্পরা একটু এলোমেলো, প্রথমেই দণ্ডাদেশ যার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে পঞ্চম স্তবকে, ধৃত হওয়ার কারণ অতিরিক্ত গুরুত্ব পেয়েছে— অস্ত্রের অভাবের সঙ্গে যোগ হয়েছে বাহনের অভাব। বিদেশী পণ্য বর্জনের আহ্বান স্থান পেয়েছে শেষ স্তবকে। দ্বিতীয় পাঠ আকারেও বড়, অবশ্য রেকর্ডের সময়সীমা প্রথম গানটিকে সংক্ষিপ্ত করে থাকতে পারে। হাল আমলে 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র' চলচ্চিত্রে যে গানটি ব্যবহৃত, তারও পাঁচটি স্তবক। একটি সামান্য হেরফের (শনিবার স্থলে 'শনিবারের') ও কয়েকটি মুদ্রণ প্রমাদ ব্যতীত হুবহু একই পাঠ বিনা সূত্র-নির্দেশে আরও সাম্প্রতিক একটি সংগীত-সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।[৬]

(তৃতীয়)

একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।
(আমি) হাসি হাসি পরবো ফাঁসি
দেখবে ভারতবাসী ॥

কলের বোমা তৈরি করে
দাঁড়িয়ে ছিলাম রাস্তার ধারে (মা গো)
বড়লাটকে মারতে গিয়ে মারলাম
আর এক ইংলন্ডবাসী ॥

শনিবার বেলা দশটার পরে
জজ কোর্টেতে লোক না ধরে (মা গো)
হলো অভিরামের দ্বীপচালান মা
ক্ষুদিরামের ফাঁসি ॥

বারো লক্ষ তেত্রিশ কোটি
রইল মা তোর ব্যাটা-বেটি (মা গো)
তাদের নিয়ে ঘর করিস মা
বৌদের করিস দাসী ॥

দশমাস দশদিন পরে
জন্ম নিব মাসির ঘরে (মা গো)
ও মা তখন যদি না চিনতে পারিস
দেখবি গলায় ফাঁসি ॥

বিভিন্ন পাঠে প্রদত্ত তথ্যগুলির সত্যাসত্য ও তাৎপর্য বিচার করে দেখা যেতে পারে। তিনটি পাঠেই আছে 'কলের বোমা', আজকের পরিপ্রেক্ষিতে এই শব্দের তৎকালীন গুরুত্ব বোঝা শক্ত। ব্রিটিশ রাজপুরুষ হত্যার উদ্দেশে বোমার ব্যবহার বাঙালি

বিপ্লবীরাই প্রথম শুরু করে, তা ট্রেন ধ্বংসকারী বিস্ফোরক হিসাবেই হোক বা হাতবোমা হিসাবেই হোক। কার্যকরী ক্ষেত্রে হাতবোমা রূপে ক্ষুদিরাম-প্রফুল্লের দ্বারাই তার প্রথম প্রয়োগ। অচিরে এই অস্ত্রের ব্যবহার এমন বিশিষ্টতা অর্জন করে যে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন ও বোমা প্রায় সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। রাষ্ট্রশক্তি-বিরোধী আন্দোলন ও তাতে প্রধান-ব্যবহৃত অস্ত্রের প্রায়শ একীকরণ ঘটে, যেমন আজকের 'সন্ত্রাসবাদ' ও এ-কে সাতচল্লিশ। বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম যুগ তাই 'বোমার যুগ', বা সরকার-বিরোধী ষড়যন্ত্র মামলাগুলি 'বোমার মামলা' নামে অভিহিত।[৭]

বোমা ব্যবহারে অসফলতার হার ও তার সীমিত শক্তি দেখে পরবর্তীকালে বাঙালি বিপ্লবীরা একে বর্জন করেন অথচ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে তখনও এই অস্ত্র সম্বন্ধে এতই সম্মোহন, যে তাঁরা অন্য অস্ত্রের কথা ভাবতেই পারছিলেন না। বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছেন,

> "বোমার কথা। বোমার কি বিমোহিনী শক্তি! রুশদেশের নিহিলিস্টদের কর্মতৎপরতার অনুকরণে এদেশে বোমা আমদানি হয়··· এদেশের অভিজ্ঞতা কিন্তু বোমা-নিক্ষেপে বোমার শিকার প্রায়ই অক্ষত থেকে গেছে। শিকারী স্বয়ং বা অপর নিরপরাধী লোক শাস্তি ভোগ করেছে। এর থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করি যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আমাদের বিপ্লবী অভিযানে এটিকে বর্জন করা হবে। এই সিদ্ধান্তে আমরা দৃঢ়ভাবে স্থির ছিলাম। কিন্তু বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশের প্রতিনিধিরা বোমা পাওয়া যাবে না জেনে বিমর্ষ হন। কারণটা জানিয়ে দেওয়ায় তাঁদের মন তখনই ভরল না। তাঁরা প্রতিবাদে জানালেন— বাংলার বোমার নামে এত আকর্ষণী শক্তি যে, বাংলায় আমরা তা আন্দাজ করতে পারি না বা পারছি না। আমরা তাঁদের 'মশার পিস্তল' দিতে চাইলেও রডার লুণ্ঠিত মালের আকাশ-ফাটা নাম তাঁদের মনে রেখাপাত করতে পারছিল না।"[৮]

ইতিপূর্বে যে একীকরণের কথা বলেছি দেখা যাচ্ছে ব্রিটিশ-বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলন ও বোমা তার একটি ক্লাসিক উদাহরণ। অন্যান্য প্রদেশবাসীর কাছে হত্যা-প্রচেষ্টার সাফল্য গৌণ হয়ে বোমার ব্যবহারই মুখ্য হয়ে উঠেছে কারণ, তাঁদের ধারণা, ব্রিটিশ-বিরোধী হিংসাত্মক আন্দোলনের তাঁদের দেশে সূচনা হবে কেবলমাত্র বোমার ব্যবহারেই। বোমা প্রায়ম্ভেই প্রাতিষ্ঠানিক তাৎপর্য অর্জন করে, বালগঙ্গাধর তিলক 'কেশরী' পত্রিকার ১৯০৮, ২৬শে মে'র সংখ্যায় লিখলেন 'Philosophy of the Bomb', বঙ্গভঙ্গের অব্যবহিত পরে বিপিনচন্দ্র পাল ইংলন্ডে গিয়ে লিখলেন 'Etiology of Bomb'।[৯]

তৎকালে ভারতীয়রা সাধারণভাবে যে সব অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত ছিল, এই বোমা ছিল তার থেকে আলাদা। ধাতব খোলে বিস্ফোরক হিসাবে ব্যবহৃত হত পিকরিক অ্যাসিড। বোমাকে 'কলের' এইজন্যই বলা হয়েছে।

দুটি পাঠে বলা হয়েছে ক্ষুদিরাম অপেক্ষা করেছিলেন 'লাইনের ধারে', 'লাইন' নিঃসন্দেহে রেললাইন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা যখন পথের ধারে অপেক্ষা করেছিলেন,

তখন 'লাইন'-এর প্রসঙ্গ এল কেন? কিংসফোর্ড-হত্যাপ্রচেষ্টার মাত্র মাস পাঁচেক আগে ১৯০৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর স্পেশাল ট্রেনে বেঙ্গল-নাগপুর লাইনে যাচ্ছিলেন লেফটেনান্ট গভর্নর। বারীন্দ্রকুমার ঘোষের দলের উদ্যোগে মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় স্টেশনের কাছে রাত প্রায় তিনটের সময় প্রবল বিস্ফোরণে লাইন উড়িয়ে দেওয়া হয় এবং গাড়ি লাইনচ্যুত হওয়া থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পায়। সংবাদপত্রে ও লোকমুখে বহুল প্রচারিত এই ঘটনার স্মৃতিই সম্ভবত অনুপ্রাণিত করেছে 'পথ'কে 'লাইন'-এ পরিবর্তিত করতে। অর্থাৎ এই ঘটনার ফলে একটা বিশ্বাসের ছবি তৈরি হয়েছে যে বিপ্লবীদের দ্বারা লাটসাহেবদের হত্যা-চেষ্টার ঘটনাস্থল হবে রেললাইন।

ক্ষুদিরাম-প্রফুল্লের আক্রমণের লক্ষ্য বলা হয়েছে 'লাট' কিংবা 'বড়লাট' অথচ কিংসফোর্ড ছিলেন জেলা ও দায়রা বিচারপতি। ভ্রমবশত যাঁদের মৃত্যু ঘটল তাঁদের পূর্বতন দুটি পাঠে বলা হয়েছে 'ভারতবাসী', আধুনিক পাঠে 'ইংলন্ডবাসী'। 'ভারতবাসী' অবশ্যই ভুল, কিন্তু তাতে যদি কেউ সহানুভূতির রেশ পান, তাঁকে মনে রাখতে হবে এঁরা মহিলা, যাঁরা বিপ্লবীদের কাছে অবধ্য, তারও কোনো উল্লেখ নেই।

ক্ষুদিরাম যখন গ্রেপ্তার হন তখন তাঁর কাছে রিভলবার ছিল কিন্তু তা ব্যবহারের সুযোগ তিনি পাননি। অথচ দুটি পাঠে অস্ত্রের অভাবই তাঁর ধরা পড়ার কারণ, এবং সামান্যতম অস্ত্র থাকলেও তিনি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হতেন না এমন বলা হয়েছে। দ্বিতীয় পাঠে এর সঙ্গে যোগ হয়েছে বাহনের অভাব। কলকাতায় আধুনিক বাইসাইকেলের আবির্ভাব ১৮৮৯ সালে, তবু লক্ষণীয়, বাহন হিসাবে ঘোড়ার কথাই বলা হয়েছে।

মামলার রায় দেওয়ার দিন নিয়ে তিনটি পাঠে মতভেদ নেই, শনিবার, কিন্তু হাইকোর্ট না জজকোর্ট তা নিয়ে সংশয় আছে, যেমন সংশয় আছে বেলা দশটা না দুটো? ক্ষুদিরামের দায়রা কোর্টের দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা হয়, দেখা যাচ্ছে গীতিকার হাইকোর্টের রায়ের দিনটিকে গুরুত্ব দেননি। কারণ, দায়রা আদালতের রায় বার বার হয় ১৯০৮, ১৩ই জুন, শনিবার, এবং হাইকোর্টে দণ্ডাদেশ বহাল থাকার রায় বার বার হয় ১৯০৮, ১৩ই জুলাই, সোমবার। শনিবার হিন্দু সংস্কারে অশুভ বার, এবং সেই বারে দ্বিপ্রহরের পর বারবেলা, অমঙ্গলজনক কাল, সে কারণেও শনিবার বেলা দুটোর কথা বলা হয়ে থাকতে পারে।

তিনটি পাঠেই অভিরাম প্রসঙ্গ আছে, এই গানের সর্বাপেক্ষা অলীক অংশ। বলা বাহুল্য অভিরাম নামে কোনো চরিত্র এই ঘটনায় অংশ নেয়নি, এমনকি অন্য কোনো অভিযুক্ত বা সাক্ষীর নামও অভিরাম নয়, ক্ষুদিরামের সহযোগীর নাম প্রফুল্ল চাকী ওরফে দীনেশ চন্দ্র রায়, তাঁরও স্বীপান্তর দণ্ড হয়নি, তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন।

মনে রাখা দরকার ১৯০৮, ৩০শে এপ্রিল থেকে ১১ই আগস্টের ঘটনাবলী ভারতের অধিকাংশ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, অধিকতর গুরুত্বের সঙ্গে বিস্তারিত খবর ছাপা হয় পূর্ব ভারতের কাগজগুলিতে। ক্ষুদিরাম ও মামলা সংক্রান্ত খবর তো বটেই, এমনকি ক্ষুদিরামের সহযোগী, যাঁর মৃতদেহের ছবি দেখে ক্ষুদিরাম শনাক্ত করেন দীনেশ চন্দ্র

রায় বলে, যাঁর আসল পরিচয় পুলিস আঁচরেই জানতে পারে, সেই প্রফুল্ল চাকীর স্বনাম ও পূর্ণাঙ্গ জীবনী অমৃতবাজার পত্রিকার ১৯০৮, ৩০শে মে'র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

তাহলে কেন এই অলীক তথ্যের সমাবেশ? প্রথম সওয়াল, গীতিকার সঠিক ঘটনা জানতেন না। এ-যাবৎ কাল সর্বত্র লেখা হয়েছে গীতিকার অজ্ঞাত, তবে তিনি পল্লীকবি বা লোকগীতিকার, এমন মন্তব্য কেউ কেউ করেছেন। নামোল্লেখের উদাহরণ মাত্র একটি, সাম্প্রতিক কালে লোকসংগীত-সংগ্রাহক ও গবেষক রণজিৎ সিংহ বাঁকুড়ার বাউল নিতাই দাসের আখড়ায় বাউল দীনবন্ধু দাসের এক সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গে বলেছেন,

"ক্ষুদিরামের ফাঁসির ঘটনা সমস্ত দেশকে তোলপাড় করেছিল। লোককবি সে ঘটনাকে কাব্যের বিষয় মনে করলেন। বাঁকুড়ার পীতাম্বর দাস লিখলেন সেই অবিস্মরণীয় গান :

একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।

প্রশ্ন উঠল, সুরটা কিরকম হবে? সবাই বললেন, দেশী সুর হওয়া চাই। মাটির সুর হওয়া চাই। তখন বাউলদের গৌরচন্দ্রিকা, একবার এস গৌর দিনমণি, গানের সুর তাতে বসিয়ে দেওয়া হল।"[১০]

সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এমনকি হুজুক, গুজব নিয়ে গান রচনার রীতি বেশ পুরনো।[১১] গায়ক-ভিক্ষুক, লোকসঙ্গীত গায়ক প্রভৃতির মাধ্যমে এই গানগুলি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ত। এখনও এই রীতি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি। যেহেতু পুরোপুরি মৌখিক-মাধ্যমে গানগুলির প্রচার ঘটে, সেজন্য একই গানের একাধিক পাঠের সন্ধান মেলে।

ক্ষুদিরামের গানের রচয়িতা একজন পল্লীকবি, যে কারণেই হোক না কেন, সম্পূর্ণ তথ্য তাঁর কাছে পৌঁছয়নি— এই সব অনুমান আলোচনার খাতিরে আপাতত স্বীকার করে নিলেও একটি প্রশ্ন অনুত্তর থেকে যায়, গীতিকারের কল্পিত কাহিনী কেন ওই বিশেষ রূপটি নিল?

পরা-আখ্যান বা মেটা-ন্যারেটিভের কতকগুলি ছক থাকে, দেশজ, ঐতিহ্যগত উপাখ্যান-গুলি একাধারে তার উপাদান ও প্রমাণ। অতিকথা বা মীথের অন্যতম বড় নিয়ন্ত্রক উদ্দেশ্য, তথাপি তার নির্মিতি ওই ছকগুলির বাইরে যেতে পারে না। ক্ষুদিরামের গানের বক্তব্য যদি এই আদলে দেখি, দাঁড়ায়— ক্ষুদিরাম কিশোর বালক, সে মারতে যাচ্ছে দুষ্টদের প্রধানকে। প্রধানই অন্যায়কারীর শক্তির চূড়ান্ত রূপ, বিপক্ষে অত্যাচারিতরা দুর্বল তাই তাদের প্রতিনিধি নিঃসহায় কিশোর। ডেভিড ও গোলিয়াথ, বালক কৃষ্ণ ও কংস। বৈপরীত্যের চরম রূপ ফোটাতেই শকটারোহী বড়লাট আর পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা দুই কিশোর। কেমন করে এমন শক্তিমান শত্রু নিধন করতে পারে তারা? তাই মামুলি অস্ত্রের বদলে অজানিত-শক্তি সম্পন্ন নতুন অস্ত্র থাকে তাদের হাতে, কলের বোমা। তাদের প্রচেষ্টা বিফল হয়, লক্ষণীয়, অস্ত্র ব্যর্থ

হয় না। কিন্তু শত্রু বেঁচে যায়। এ ঘটনাও নতুন নয়, মেঘের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে, নিদ্রাবাণ নিক্ষেপ করে, মায়াজাল বিস্তার করে অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে শত্রুদের আমরা বার বার বাঁচতে দেখেছি। ক্ষুদিরাম ধরা পড়ত না, যদি তার কাছে অস্ত্র থাকত। রূপকথার রাজকুমারকে বাঁচায় তার পক্ষীরাজ ঘোড়া, রাণা প্রতাপকে প্রাণ দিয়ে বাঁচায় প্রভুভক্ত চৈতক। হায়, তার বাহনও ছিল না। এবারে বিচারের পালা। ক্ষুদিরাম ও তার সহযোগী অভিরাম অভিযুক্ত। অতিকথায় যুগল-নায়করা আমাদের অপরিচিত নয়, তাদের আর্কেটাইপাল ইমেজ ঘুরে ফিরে আসে। তাই কানাই-বলাই, নিমাই-নিতাই, জগাই-মাধাইয়ের মতো ক্ষুদিরামের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে তার নাম রাখা হয়, অভিরাম। শনিবারের মতো অশুভ, অমঙ্গলকর দিনে দণ্ডাদেশ হয়। যুগল নায়কত্ব হলেও দুজনের গুরুত্ব সমান হয় না, কৃষ্ণ-বলরামের কৃষ্ণের মতো একজন হয় মূল নায়ক। ক্ষুদিরামই এখানে মূল নায়ক, তাই সবথেকে গৌরবজনক, সর্বত্যাগী আত্মোৎসর্গের দণ্ড জোটে তার ভাগ্যে, অভিরাম অপ্রধান নায়ক, তাই তার হয় দ্বীপান্তর।

অতিবৃত্তান্ত কথন এখানেই শেষ হতে পারত, কিন্তু তাহলে নির্দিষ্ট সমাপ্তি ঘটে না, বা বলা উচিত বৃত্ত অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই ক্ষুদিরাম বলে যায় সে আবার জন্মগ্রহণ করবে। ধর্মীয় নেতৃত্বের উত্তরাধিকারীর মতো, অবতার পুরুষের মতো সে বহন করবে দৈহিক চিহ্ন, ফাঁসির দাগ, যা দেখে শনাক্ত করা যাবে তাকে। কিন্তু কেন ফিরে আসবে সে? কারণ তার ঈপ্সিত কাজ শেষ হয়নি, দুষ্টদলন, শত্রুনিধন যে এখনও বাকি।

একেবারে শেষে জুড়ে দেওয়া হয়েছে বিদেশী পণ্য বর্জনের আহ্বান। তাকে শুধুমাত্র শহীদ কিশোরের শেষ অনুরোধ ভাবা ভুল হবে। এতক্ষণে ক্ষুদিরাম লৌকিক স্তর থেকে উত্তীর্ণ, তার মিনতিরও অনুরোধের স্তর থেকে উত্তরণ ঘটেছে, তাকে লঙ্ঘন করার সাধ্য কারোর নেই। অনিবার্য ফলদায়ী জেনেই এই প্রচারের অবতারণা।

নিকট-অতীতের ঘটনা কেমন করে পুরাকথার বুনোটে বোনা হয়, বাস্তব ঘটনার বর্ণনে কেমন করে অবাস্তব, অলীক উপাদান কোনো স্থির পরিকল্পনা, ছক মেনে ঢুকে পড়ে, তার কিছুটা অনুমান করা যাচ্ছে। সে প্রক্রিয়ার সঙ্গে কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য জানা বা না-জানার কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ রচয়িতা 'অশিক্ষিত' পল্লীকবি হওয়ার সম্ভাবনা এইজন্য প্রবল নয় যে তিনি খুঁটিনাটি তথ্য জানেন না। বরং এই কারণে যে, তথ্যানুসারী হওয়ার বাধ্যবাধকতা 'শিক্ষিত'জনেরই থাকে, যাতে, তাঁদের ধারণা বক্তব্যের বিশ্বাসযোগ্যতায় বৃদ্ধি পায়। অপর দিকে, বিশ্বাস ও তথ্য যে পারস্পরিক নির্ভরশীল নয়, এ তথ্য তথাকথিত অশিক্ষিতদের খুব ভালো করেই জানা, তাঁরা এটাও জানেন যে বার বার পুনরাবৃত্ত ছক অনেক দ্রুত সাধারণজনের ধারণাক্ষম হতে পারে, পৌঁছতে পারে তাঁদের বিশ্বাসের বৃত্তে।

উপাদানের মতো গানটির গঠনেরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যা চোখ এড়ায় না।

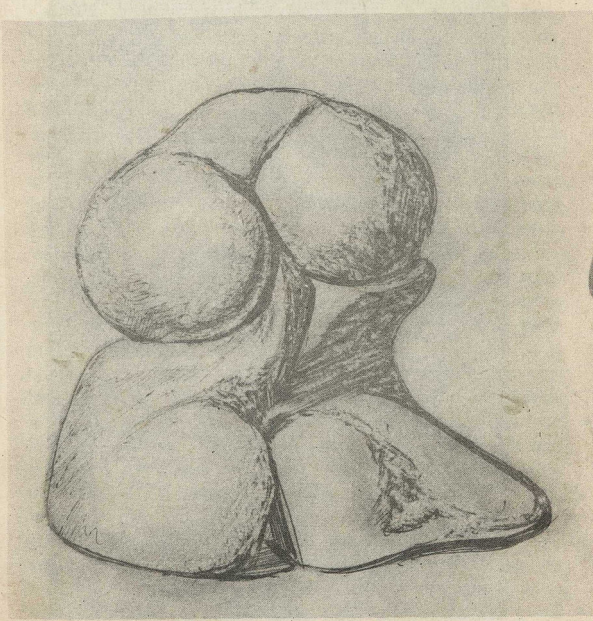

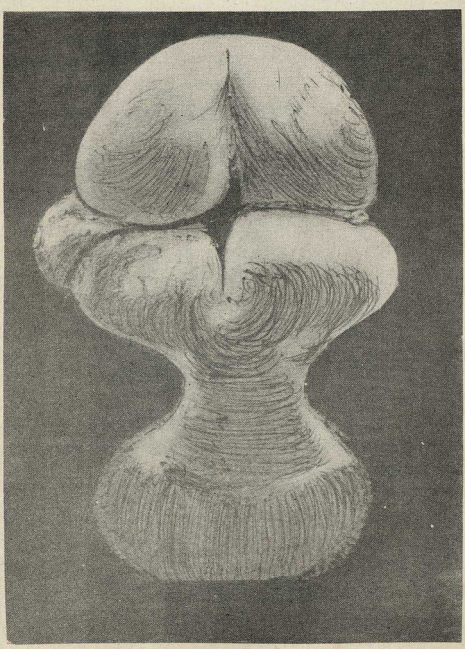

প্রথমত, কাব্যরূপে। দূর-অতীতের অতিকথা অনায়াসে গদ্যরূপে নিতে পারে, বিচ্যুতি-অতিরঞ্জনের সুযোগ-সম্ভাবনা থাকলেও শুরু-ঘটনা-সমাপ্তির কাঠামো একেবারে বাঁধাধরা, কথকের পক্ষে তার ব্যত্যয় ঘটাবার সুযোগ নেই। কিন্তু নিকট-অতীতের ঘটনা গদ্যরূপে অতিকথার চেহারা নিতে গেলে তাকে সত্য-মিথ্যার মিশাল দেওয়া গুজবই বলতে হবে। অথচ একই বৃত্তান্ত কাব্যরূপে অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করে। আলোচ্য ক্ষুদিরাম কাহিনীকে গদ্যে রূপান্তরিত করে তার বিস্তারের একটি কাল্পনিক অবস্থা ভাবলে এই বক্তব্যের যৌক্তিকতা কিছুটা বোঝা যাবে।

গানটি ভণিতাবিহীন, অর্থাৎ গীতিকারের নাম জানা যাচ্ছে না। তার কারণ, আত্মগোপনের প্রয়াস হতে পারে, তাৎপর্য আরও কিছুটা বেশি। গান পূর্বকালে মৌখিক-বিস্তৃতি নির্ভর ছিল বৃহদংশে, অর্থাৎ গানটি প্রচারিত হত মূলত গায়নের মাধ্যমে এবং ভণিতা-অংশ দ্বারাই গীতিকার তাঁর ব্যক্তিগত স্বীকৃতি লাভ করতেন। ভণিতা প্রয়োজনীয়, তবু তাকে গানের সঙ্গে জুড়তে পারম্পর্য, প্রাসঙ্গিকতার দরকার হয়। ভণিতা শুধু নাম জানায় না, তার মাধ্যমে গীতিকার স্বয়ং, গানের বক্তব্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যান, যেমন রামপ্রসাদ সেন 'শ্যামা মা উড়াচ্ছো ঘুড়ি' গানে "প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি / ভব সংসার সমুদ্র পাড়ে পড়বে গিয়ে তাড়াতাড়ি" বা কুবীর কবিদার 'ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন' গানে "ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডাঙ্গায় ডিঙে, চালায় আবার সে কোন জন / কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাবো গুরুর শ্রীচরণ"। আধুনিক রাজনৈতিক, দেশাত্মবোধক গানেও তাই, বরং আরও প্রকট, মুকুন্দদাস 'ভয় কি মরণে' গানে বলেন "লইয়ে কৃপাণ, হও আগুয়ান / নিতে হয় মুকুন্দেরে নিও গো সঙ্গে"। শিরোনামযুক্ত (প্রথমে কবিতা, পরে সুরারোপিত) বা বিহীন গানের মুদ্রিত রূপের যে 'নৈর্ব্যক্তিক' চেহারা আমরা দেখি, যাতে কবির বা গীতিকারের নাম পৃথক-ভাবে মুদ্রিত, তা অনেক হাল আমলের। ক্ষুদিরামের গানকে ভণিতাবিহীন অবয়ব দেওয়ার জন্যই গানটি প্রথম পুরুষে বর্ণিত, এমনও হতে পারে।

আবেগময় রূপ উত্তম পুরুষের জবানীর আর এক সম্ভাব্য কারণ। বাঙালির কাছে বিদায়, বিসর্জন। বড় আবেগমথিত, অশ্রুদীর্ণ তার রূপ। শচীমাতা, বিষ্ণুপ্রিয়াকে কাঁদিয়ে নিমাই চলে যান চিরকালের মতো, বৎসরান্তিক ক্রন্দনে মণ্ডপ শূন্য করে বিজয়াদশমীর দিন দুর্গা বিদায় নেন। কান্না বার বার ফিরে আসে অবধারিত বিচ্ছেদে, তাই বিষ্ণুপ্রিয়া গায় 'শচীমাতা গো, আমি চার যুগে হই জনম দুখিনী'। নিশ্চিত অকালমৃত্যু যার জন্য অপেক্ষমাণ, সেই মাতৃহীন কিশোরের নিজের মুখের কথায় শেষ বিদায় আরও মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে।

তথ্যের অভ্রান্ততা বক্তব্যের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ায়, এ ধারণার কথা আমরা আগে বলেছি। তারই হাত ধরে আসে আর এক ধারণা, বক্তব্যের পক্ষে দূর-প্রাসঙ্গিক কোনো তথ্য শুধু সঠিক হওয়ার কারণে গুঁজে দেওয়া যায়। অর্থাৎ প্রাসঙ্গিকতাটা খুব বড় ব্যাপার নয়, একটা সম্পর্ক থাকলেই চলে, কিন্তু তথ্যটা সঠিক এবং সেই কারণে তাকে

আখ্যানে স্থান দিলে আখ্যানের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। ক্ষুদিরামের গানের তৃতীয় পাঠে 'মা' কোনো আড়াল না রেখে দেশমাতায় পরিবর্তিত হন, তেত্রিশ কোটি বারো লক্ষ ভারতবাসীকে তাঁর পুত্রকন্যা বলা হয়। বৃহৎ সংখ্যার ধারণা অস্পষ্ট হতে পারে, যেমন 'লক্ষ লক্ষ', 'কোটি কোটি', হতে পারে স্পষ্ট, যেমন 'সপ্ত কোটি' বা সুস্পষ্ট, যেমন '২৯ কোটি ৪৩ লক্ষ ৬৯ হাজার', কিন্তু 'শিক্ষিত' জনের পছন্দ সুস্পষ্টতা কারণ তাকে সঠিকত্বের সঙ্গে সমার্থক ভাবা হয়। সচেতনভাবে সঠিকত্ব বজায় রাখা হয়। ১২৮১ সনে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালির জনসংখ্যা লিখেছেন ছয় কোটি[১২], তার ছয় বছর পর 'আনন্দমঠ'-এ লিখলেন "সপ্ত কোটি কণ্ঠ-কল-কল-নিনাদ-করালে।"[১৩] আমার ধারণা ক্ষুদিরামের গানে 'বারো লক্ষ তেত্রিশ কোটি...' ইত্যাদি স্তবকটি পরবর্তীকালের সংযোজন। উপরিল্লিখিত কারণে তো বটেই, তাছাড়া ১৯০১ সালের জনগণনায় ভারতের মোট জনসংখ্যা নির্ণয় হয়েছিল ২৯ কোটি ৪৩ লক্ষ ৬১ হাজার ৫৬ জন।[১৪]

ক্ষুদিরামের গানে এমন খণ্ড-বিচ্ছিন্ন 'সঠিক' সংযোজন ছাড়াও পরবর্তীকালে কৃত শিক্ষিতজনের ঢালাও সংস্কারকর্মের নমুনাও আছে, যাতে তথ্যগত ভ্রান্তি দূর করার চেষ্টা স্পষ্ট। তাগিদ একই, 'সঠিকত্ব'।

(চতুর্থ)

একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি।
হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী ॥
পাটের বোমা তৈরি করে,
দাঁড়িয়েছিলাম গাছটি ধরে,
(মা গো) জজসাহেবকে মারব বলে, মারলাম (দুই) নির্দোষী ॥
হাতে যদি থাকত ছোরা
তোর ক্ষুদি কি পড়ত ধরা
রক্তে হত ছড়াছড়ি (মা), দেখত ভারতবাসী ॥
শনিবার দুটোর সময়
পুলিশ কোর্ট হল লোকময়,
জজ-ম্যাজিস্টর বিচার করে, রায় দিল (মা)
ক্ষুদিরামের ফাঁসি ॥
কাঁচের বাসন, কাঁচের চুড়ি,
পরো না মা বিলাতি শাড়ি,
(মা গো) মনের দুঃখ রইল মনে,
হলো না মোর স্বদেশী ॥
দশমাস দশদিন পরে,
ক্ষুদিরাম তোর আসবে ফিরে, (মা গো)
(তখন) যদি না চিনতে পারো মা,
দেখবে গলার ফাঁসি ॥[১৫]

এই পাঠটি মূলে নয়, তার পরবর্তীকালে সংশোধিত রূপে, এমন অনুমানের কারণ কী? প্রধানত 'কলের বোমা'-র বদলে 'পাটের বোমা' শব্দ ব্যবহার। কারণ, 'কলের বোমা' বিপ্লবীদের দ্বারা বর্জিত হওয়ার পর বিস্মৃতিতে হারিয়ে যায়। তার অনেক পরে আসে 'পাটের বোমা' অর্থাৎ আর্সেনিক সালফাইড ও পটাশিয়াম ক্লোরেটের মিশ্রণ, পাটের রশি দিয়ে জড়িয়ে বাঁধা। ক্ষুদিরাম 'পাটের বোমা' ব্যবহার করেননি, বলাই বাহুল্য। ক্ষুদিরাম নিরস্ত্র অবস্থায় ধরা পড়েন, তথ্যগত এই ভুলটি ছাড়া অন্য ভ্রান্তি কিছু নেই। লাটসাহেবের পরিবর্তে 'জজসাহেব', ভারতবাসী স্থলে 'নির্দোষী', অভিরামের অনুল্লেখ ইত্যাদি তার প্রমাণ। অনুমান 'লাটসাহেব, ভারতবাসী'-র মতো 'কলের বোমা'কে ভুল ভেবেই সংশোধন করা হয়েছে। সংস্কারকর্তা খুঁটিনাটি সম্বন্ধে কত ওকিবহাল ছিলেন তার প্রমাণ পথ বা লাইনের পরিবর্তে গাছটি ধরে দাঁড়িয়ে থাকার উল্লেখ। ক্ষুদিরামের মামলায় এই গাছ প্রসঙ্গ অনেক বার এসেছে। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ক্ষুদিরাম দুটি জবানবন্দী দেন, প্রথমটি এইচ. সি. উডম্যানের কাছে ১৯০৮, ১লা মে, দ্বিতীয়টি ই. ডব্লু. বার্থউডের কাছে ২৩শে মে তারিখে। প্রথম জবানবন্দীতে তিনি বলেন একটি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে তাঁরা কিংসফোর্ডের অপেক্ষায় ছিলেন। দুজনের পায়েই জুতো ছিল কিন্তু বোমা ছোঁড়ার আগে গাছতলায় তাঁরা জুতো ছেড়ে রেখে যান। দ্বিতীয় জবানবন্দীকালীন তাঁকে ঘটনাস্থলের একটি নকশা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়, গাছটি কোথায়? ক্ষুদিরাম নকশায় গাছ ও গাছের নিচে জুতো রাখার স্থানটি চিহ্নিত করেন।

কালসীমার দিক থেকে আলোচ্য গানটি নিশ্চয় প্রাক-মুদ্রণ বা প্রাক-এনলাইটেনমেন্ট যুগের নয়। কিন্তু পুরোপুরি সেই আবহটাই গানে উপস্থিত। বাস্তবকে অতিকথার ছাঁচে ঢালাই করে তাতে চিরন্তনতার স্বাদ এনে দেওয়া, বাড়তি, বেখাপ্পা বাস্তব-অংশটুকু বর্জন করতে যেমন দ্বিধা নেই, তেমনি নিঃসঙ্কোচে ছাঁচ পূর্ণ করতে অন্তর্ভুক্ত হয় নতুন চরিত্র বা অনুপুঙ্খ। উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যই যেখানে সব থেকে বড় ভূমিকা পালন করে, বাস্তবিকতা ধরতাই মাত্র, মীথ গড়ে ওঠার এমত প্রক্রিয়া, সন্দেহ নেই, মুদ্রণ-পরবর্তী যুগে ইনফরম্যাটিকসের আক্রমণে বিপর্যস্ত। তবু রেশ থেকে যায়। সাম্প্রতিক কালের অনুরূপ একটি গানের বক্তব্য বিচার করলে আমরা দেখব তথ্য জানা থাকলেও কেমন ছাঁচ পাল্টায় না, আধুনিকতার প্রলেপ ভেদ করে উঁকি দেয় আদ্যিকালের পুরাছবি। গানটির বিষয় ইন্দিরা গান্ধির মৃত্যু, রচয়িতা বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী-বাসিন্দা বাউল গোষ্ঠগোপাল দাস।[১৬]

অক্টোবরের একত্রিশ, উনিশশো চুরাশি
বুধবার দুপুরে হায়রে, কি নিদারুণ খবর পেল ভারতবাসী বেতারে।
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি ভারতেরই মাতা,
মতিলাল নেহরুর পুত্র জহরলাল ইন্দিরাজির পিতা।

দেহরক্ষীর গুলির ঘায়ে জ্ঞান হারালেন তিনি,
লক্ষ লক্ষ মানুষ কান্দে এই খবর শুনি।
কেউ বা ভাবে সত্য কথা, কেউ বা ভাবে মিথ্যা রে,
কি নিদারুণ খবর…
সন্ধ্যাবেলা বেতারেতে খবর ভেসে এলো,
প্রধানমন্ত্রী জাতির মাতা চিরবিদায় নিলো।
কোটি কোটি সন্তান কান্দে দিশাহারা হইয়া,
যুগে যুগে এসো তুমি জগতমাতা হইয়া।
তোমার লাগি কান্দে আকাশ, কান্দে পরদেশী,
স্বর্গধামে থাকো মা গো হইয়া ভারতমাতা রে,
কি নিদারুণ খবর…
দুঃখী দেশের সুখের লাগি শপথ নিলেন যিনি,
তার রক্তে হলো রাঙা মোদেরই রাজধানী।
দুঃখী জাতের মনের ব্যথা কে বুঝিবে হেথা,
সত্তর কোটি মানুষ কান্দে আছো তুমি কোথা।
কে বলিবে মোদের কথা গিয়া বিশ্বদরবারে,
কি নিদারুণ খবর…॥

ক্ষুদিরামের গানের সঙ্গে বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য স্পষ্ট, উভয়েরই কেন্দ্রবিন্দু আত্মবলিদান, তা ফাঁসিকাঠেই হোক বা দেহরক্ষীর গুলিতেই হোক। মিল আরও অনেক, ভণিতা-বিহীনতা, মৃত্যুর পর ফিরে আসার প্রার্থনা, সত্তর কোটি ভারতবাসীর উল্লেখ, ইত্যাদি। কিন্তু বৈসাদৃশ্য আছে, এবং তা আপাত-অস্পষ্ট হলেও সাদৃশ্যের অপেক্ষা গুরুতর। সাল, তারিখ, বার সমেত ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তিনি দিয়েছেন, কিন্তু বয়ান ভারতীয় বেতারের। আসল ঘটনার সঙ্গে ভারতীয় বেতার-প্রদত্ত বিবরণের গরমিল ছিল। লক্ষণীয়, গীতিকার প্রকৃতপক্ষে কী ঘটেছিল তাকে উপেক্ষা করে বেতার-প্রচারিত বয়ান ও জনতার প্রতিক্রিয়াকেই উপজীব্য করেছেন। প্রদত্ত তথ্যের প্রতি তিনি একান্ত বিশ্বস্ত এবং তথ্য জানাচ্ছেন উৎস কী তা জানাবার পর। ঘটনাটি সম্পর্কে তাঁর 'প্রথম অভিজ্ঞতা' অর্থাৎ নিজে যে ভাবে প্রথম জেনেছেন, কেবলমাত্র তাকে অবিকৃতভাবে নথিবদ্ধ করার প্রয়াস ভাবা ভুল হবে, কারণ গীতিকার জানেন তাঁর নিজের আর গানের সম্ভাব্য শ্রোতাদের ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞানের কোনো হেরফের নেই। ইলেকট্রনিক মিডিয়া কতটা সর্বগ্রামী জানেন বলেই বেতারে ভেসে আসা খবর শুনে সত্তর কোটি মানুষের ক্রন্দনের অবতারণা। আসলে কী ঘটেছিল সে প্রশ্ন অবান্তর, ক্ষুদিরামের গানের গীতিকার গান শুরু করেছিলেন ঘটনার যে আখ্যান দিয়ে, তার অনুমোদন ছিল। অতিকথার অনুমোদন। গোষ্ঠগোপাল গান শুরু করেন যে

আখ্যান দিয়ে, তারও অনুমোদন আছে, ইলেকট্রনিক মাধ্যম, ইনফোটেকের অনুমোদন। তবু এমন প্রখর বাস্তবজ্ঞানীও ঐতিহ্যানুসারী পুরাতনী অতিকথার ছাঁচ এড়াতে পারেন না। সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী আর্কে'টাইপাল ইমেজে পরিবর্তিত হন, 'জাতির মাতা' থেকে 'ভারতমাতা'-য় শেষ নয়, তাঁকে জগতের মাতা হয়ে যুগে যুগে ফিরে আসার আহ্বান জানানো হয়। অবশ্যই আর্কে'টাইপালে পেঁছবার একটা বড় দরজা, মৃত্যু। তবু তা দিয়ে এর সবটুকু ব্যাখ্যা হয় না। অতিকথার শিকড় যে কত গভীরে, তাকে সমূলে উপড়ানো যে কত কঠিন, সে কথাই নতুন করে মনে করিয়ে দেয়। আসলে গানটি সর্বার্থে বর্ণসংকর, মুদ্রণ-পূর্ব আর -পরবর্তী যুগ-বৈশিষ্ট্যের জারজ।

আমরা আগে বলেছি ঐতিহাসিকরা ক্ষুদিরামের গানের কথা উল্লেখ করেছেন। বাস্তবের বিচ্যুতি যাঁদের কাছে সদা পরিত্যাজ্য, তাঁরা অলীক কথায় ভরা এমন গানকে বিনা সমালোচনায় রেহাই দিলেন কেন, সে প্রশ্নের উত্তর আলোচনাসাপেক্ষ।

ঐতিহাসিকের অন্বেষিত সত্য আর অতিকথার সত্য, বলা বাহুল্য এক নয়। যার সত্যতা বার বার যাচাই করে নেওয়া চলে, ঐতিহাসিক এমন সত্যই খোঁজেন। সে সত্য অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ— যা কিছু হতে পারে, কিন্তু চিরন্তনতার হক তার নেই। অপরদিকে অমরত্বের দাবিতেই অতিকথার জন্ম। সে বেঁচে থাকার রস সংগ্রহ করে বিশ্বাসে, বিস্তারে। সমস্যা হচ্ছে অতীতকথা পুনর্গঠনমাণের কাজে কাঁচামাল রূপে প্রায়শ অতিকথা আর ঐতিহাসিক-সন্ধানিত সত্যের দুধে-জলে সহাবস্থান। সত্য উদ্ধারে বদ্ধপরিকর ঐতিহাসিক প্রাথমিক কাজ যা করতে পারেন, অসম্ভবকে ছেঁটে ফেলা। রাজা রইল, রাজ্য রইল, বাদ গেল রাজার পক্ষীরাজ ঘোড়া। অবশিষ্ট অংশ বিতর্কিত তথ্য হয়ে বিশেষজ্ঞ, যতদিন না অন্য উল্লেখ, প্রমাণাদির কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে তা প্রমাণিত সত্য-এর পদে উন্নীত হয়।

দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিকের প্রথম পছন্দ ঘটনা আর প্রতিক্রিয়াজনিত কর্ম। অথচ প্রতিক্রিয়ার জন্ম যে মানসিকতায় তার উদ্ভব বিকাশের রূপ অনুসন্ধানে তিনি ততটাই নিরুৎসাহ। বিশ্বাসের শিকড় খুঁজতে তিনি ধর্মীয় বা রাজনৈতিক তত্ত্ব উল্লেখে রাজি কারণ তার দৃঢ়-বিধিবদ্ধ লিপিবদ্ধ পাঠ আছে। কিন্তু যার নেই এমন বিশ্বাসও তো অগুণতি, তাদের জন্য বরাদ্দ উপেক্ষা, অবহেলা।

ক্ষুদিরামের গানের বেলায়ও তাই ঘটেছে। উপরন্তু সেখানে রয়েছে সমান্তরাল তথ্য, যার উৎস ঐতিহাসিকের মনোমতো, কাজেই উল্লেখের বেশি গুরুত্ব তার ভাগ্যে জোটেনি। শিক্ষিতমানস থেকে অভিরামদের নির্বাসন ঘটেছে, সবার অলক্ষ্যে নিঃশব্দে। □

টীকা

১. শিশির কর, ব্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই, কলিকাতা ১৯৮৮, পৃ. ২৪।

২. "...বিহারের মানুষ বৈকুণ্ঠ সুকুল...দ্বিতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার রাজসাক্ষী বেতিয়ার ফণী ঘোষকে হত্যার অপরাধে ফাঁসির আসামী। ফাঁসির আগের রাতে

বিভূতিবাবু (বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত) ও সুকুলজী ছিলেন কাছাকাছি দুই 'সেলে' যদিও সুকুলজী 'Condemned Cell'-এ থাকার দরুণ তাঁরা কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছিলেন না।" বাকিটুকু বিভূতিবাবুর জবানীতে, "হঠাৎ সুকুল ভাঙা বাংলায় বলল, একবার খুদিরামের ফাঁসির গানটা গান না দাদা। সেই— হাসি হাসি পরব ফাঁসি!

"...দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুরু করলাম গান···আর-এক খুদিরাম শুনতে চাইছে সেই খুদিরামের গান···। মাঝে মাঝে সুকুলের কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি আমার সঙ্গে গাইবার চেষ্টা করছে— গাইছেও।"

(চিন্মোহন সেহানবীশ, রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ, কলিকাতা ১৩৯২, পৃ. ১৭৮-৭৯।)

শহীদ-গীতি রূপে আজও এর বহমানতার উদাহরণ জাহানারা ইমামের ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নিহত শহীদ পুত্র রুমীর স্মৃতিচারণ, "তবু ছেলেরা যুদ্ধে যায়। বেশির ভাগই মাকে লুকিয়ে, বিছানায় পাশ-বালিশ শুইয়ে, রাতের আঁধারে পালিয়ে চলে যায়। মায়ের কান্নাকাটির ভয়ে ব'লে যেতে পারে না। কিন্তু মনে মনে বিদায় চেয়ে নেয় মায়ের কাছ থেকে : একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।" (পৃ. ২৮) "মা রুমীর মাথার কাছে বসে তার চুলে বিলি কাটতে লাগলেন, সাইড-টেবিলে রেডিওটা খোলা ছিল···হঠাৎ কানে এল ক্ষুদিরামের ফাঁসির সেই বিখ্যাত গানের কয়েকটা কলি : একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি ওমা, হাসি হাসি পরবো ফাঁসি দেখবে জগৎবাসী— রুমী বলল, 'কি আশ্চর্য আম্মা। আজকেই দুপুরে এই গানটা শুনেছি। রেডিওতেই ···আবার এখনও— একই দিনে দু'বার গানটা শুনলাম। না জানি কপালে কি আছে!" (পৃ. ৪৬) "কেন যুদ্ধ হয়? কেন মায়ের বুক খালি করে ছেলেরা যুদ্ধে যায়? কেন হাসি হাসি মুখ করে ছেলেরা বলে 'বিদায় দে মা ঘুরে আসি?'" (পৃ. ৫৯)।

(জাহানারা ইমাম, বিদায় দে মা ঘুরে আসি, ঢাকা ১৯৯২।)

৩. ক্ষুদিরামের গানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, দু'রকমেরই উল্লেখ আছে,

"বাঙলার শহরে-শহরে, গ্রামে-গ্রামান্তরে কত গান রচিত হল এই কিশোর বীরের উদ্দেশ্যে স্তুতি ও বন্দনা জানিয়ে। কত চারণ গেয়ে গেলেন সে-সব গান। পথের ভিখারীর কণ্ঠে আজও শুনি : একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।" (ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়, ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব, পৃ. ৫৬)। "Terrorist heroism evoked tremendous admiration from very wide circles of educated Indians and sometimes from others, too — a street beggar's lament for Khudiram for instance, could still be heard in Bengal decades after his execution" (Sumit Sarkar,

Modern India 1885-1947. p. 124). "Another revealing fact was the universal sympathy felt for the revolutionaries. The accused in the Alipore Conspiracy Case was regarded as martyrs and those like Profulla Chaki and Khudiram who had lost their lives became heroes of folk songs sung all over the country. Even professional beggars substituted these for their traditional religious songs..." (R. C. Majumdar, *History of the Freedom Movement in India*. Vol. II. p. 260).

৪. কলাম্বিয়া রেকর্ড নং GE. 7148, গায়ক তারা ভট্টাচার্য্য। রেকর্ডটির একপিঠে 'একবার বিদায় দে মা', শিরোনাম '(ক্ষুদিরামের গান)', অপর পিঠে 'হাসি মুখে ফাঁসি বরণ করেছ সেদিন অবহেলায় / বীর ক্ষুদিরাম, লহ গো প্রণাম ভুলিনি মোরা তোমায়'। গীতিকার রমেন চৌধুরী, সুরকার কালোবরণ দাস—বলা বাহুল্য দ্বিতীয় গানের।

৫. গোপাল ভৌমিক, বিপ্লবী বাংলার প্রথম শহীদ্ ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী, কলিকাতা ১৩৫৪, পৃ. ৭৫-৭৬।

৬. প্রভাতকুমার গোস্বামী সম্পা., হাজার বছরের বাংলা গান, কলিকাতা ১৩৭৬, পৃ. ১৬০-৬১।

৭. প্রসঙ্গত, ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর *History of the Freedom Movement in India* (Vol. II Calcutta 1963) গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন 'The Cult of the Bomb'।

৮. যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি, কলিকাতা ১৯৮২, পৃ. ৪৪-৪৫, পুনরায় অনুরূপ মন্তব্য পৃ. ২৫৩।

৯. তদেব, পৃ. ২৯৪।

১০. রণজিৎ সিংহ, মাটির সুরের খোঁজে, কলিকাতা ১৯৯০, পৃ. ১৭। সাম্প্রতিক (২০.১.৯৫) একটি চিঠিতে রণজিৎবাবু আমাকে জানিয়েছেন, "আমাদের প্রশ্ন ছিল, বাউল গানের সুর বিষয়ে। তার কি কোনো নির্দিষ্ট সুর আছে? না কি অঞ্চলভেদে ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক সুর কাঠামোয় (ঝুমুর, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া) তা গাওয়া হয়? বাউল নিতাই দাসের জয়দেব মেলার আখড়ায় খালেদ চৌধুরী প্রশ্নটি তোলেন। নিতাই দাস তার উত্তর দিচ্ছিলেন। প্রশ্নের মীমাংসাও ছিল তাঁর উত্তরে। সেই আখড়ায় বাউল দীনবন্ধু দাসও ছিলেন। তিনি এই প্রশ্নের সূত্রে 'ঝুমুর বাউল'-এর কথা বলেন। তার সুর-কাঠামো বুঝিয়ে দেন 'বাউলদের গৌরচন্দ্রিকা' 'একবার এস গৌর দিনমণি' আর 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' গান দুটি গেয়ে গেয়ে। প্রথমটির সুর দ্বিতীয়ে বসানো হল। গান দুটির সুর বোঝানোর আগে অবশ্য 'একবার বিদায় দে মা'-র রচনা ও সুর-ব্যবহারের ইতিহাস বলেছিলেন। আর তা ওইটুকুই। রচয়িতার বিষয়ে বিস্তারে বলেন নি। আমরাও জানতে চাই নি।"

লক্ষণীয়, দীনবন্ধু দাসের বক্তব্য নিতাই দাস অসমর্থন করেননি। সাক্ষাৎকারের তারিখ ১৯৭০ সালের জানুয়ারি মাস, নিতাই দাসের বয়স তখন ৮৩। অর্থাৎ ১৯০৮ সালে তিনি ২১ বছরের যুবক, গীত রচনা ও সুরারোপের ঘটনা জানা তাঁর পক্ষে খুবই সম্ভব।

১১. একটি স্মৃতিকথায় দেখি, "...সন ১২৬৪ সালের কথা সেই বৎসরেই সিপাহী বিদ্রোহ হয়। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে কলিকাতা হুগলী বর্দ্ধমান জেলার গ্রামে গ্রামে একটা গুজব উঠিল মরা মানুষ ফিরিয়া আসিবে ... সেকালে এরূপ কোন হইলে হুজুগ বৈষ্ণবেরা সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার গান রচিত করিত। নূতন গান গাহিয়া বেশ দু পয়সা রোজগার করিয়া লইত।"
(অম্বিকাচরণ গুপ্ত, 'নিজের কথা' প্রজাপতি, ১৩১৯ পৌষ, পৃ. ২৩৭-৩৮।)

১২. "তোমায় কি বলিয়া ডাকিব মা? এই ছয় কোটি মুণ্ড ঐ পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত করিব... এই ছয় কোটি কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া হুঙ্কার করিব,—এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব"।
(বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আমার দুর্গোৎসব, কমলাকান্তের দপ্তর, বঙ্গদর্শন ১২৮১ কার্তিক।)

১৩. বঙ্গদর্শন ১২৮৭ চৈত্র সংখ্যা থেকে 'আনন্দমঠ' ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে শুরু করে। পঙ্‌ক্তিটি আনন্দমঠ-এর অন্তর্ভুক্ত বন্দেমাতরম গানের।

১৪. প্রাসঙ্গিক তথ্য হিসাবে পূর্বপর কালের ভারতের মোট জনসংখ্যা জনগণনায় কী নির্ধারিত হয়েছিল, জানা যেতে পারে, ১৮৮১ সাল—২৫৩, ৮৯৬, ৩৩০ জন।

১৮৯১ ,, — ২৮৭, ৩১৪, ৬৭১ ,,
১৯০১ ,, — ২৯৪, ৩৬১, ০৫৬ ,,
১৯১১ ,, — ৩১৫, ১৫৬, ৩৯৬ ,,
১৯২১ ,, — ৩১৮, ৯৪২, ৪৮০ ,,
১৯৩১ ,, — ৩৫২, ৮৩৭, ৭৭৮ ,,

(J. H. Hutton, *Census of India 1931*, Vol. I, Reprint Delhi 1989, p. 34.)

লক্ষণীয়, '৩৩ কোটি ১২ লক্ষ' সংখ্যাটি অনুপস্থিত, দ্বিতীয়ত মধ্যবর্তী কোনো অনুমান হলেও তার সময় ১৯২১-৩১-এর মাঝামাঝি কোনো সময়।

১৫. মনোরঞ্জন ঘোষ, অগ্নিশিশু, ক্ষুদিরাম, কলিকাতা ১৩৭৭, পৃ. ১২৩।

১৬. T-Series ক্যাসেটে প্রকাশিত, নং 046।

[তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করেছেন অধ্যাপক প্রতাপশঙ্কর লাহিড়ী, শ্রীমেঘদূত দাঁ ও শ্রী বিমল মজুমদার, এঁরা সকলেই আমার ধন্যবাদার্হ। বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন অধ্যাপক প্রদ্যোতকুমার মুখোপাধ্যায়, যিনি অধুনা-বিস্মৃত গ্রামোফোন রেকর্ডটির কথা স্মৃতি থেকে উদ্ধার করেছেন, শ্রী অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁর সৌজন্যে HMV অভিলেখাগার থেকে গানের পাঠটি পাওয়া সম্ভব হয়েছে ও শ্রীরণজিৎ সিংহ।]